দৈনিক সংবাদ
তারিখ ...10 JAN 1994...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6
17

জাতীয় গ্রন্থনীতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

সবাই আশা করছে, এবার একুশের মরসুমে প্রধানমন্ত্রী দেশের অনেক দিনের একটা প্রত্যাশা পূরণ করবেন। জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা করবেন। কথাটা কানে আসছে এবং এমনভাবে আসছে যাতে একে একটি নেহাৎ গুজব বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। জাতীয় গ্রন্থনীতির আওতায় কি আসবে, আর কি আসবে না, আমি জানি না। এই গ্রন্থনীতির উদ্যোক্তা কারা? সাধারণ নিয়মে হওয়া উচিত লেখকেরা, প্রকাশকেরা, পুস্তক বিক্রেতারা, এবং সবশেষে পাঠকেরা। কিন্তু সব শেষের দলকে বাদ দিতে হচ্ছে, যেহেতু পাঠকেরা কোন সংগঠিত শক্তি নয়। কোনো কিছুর উদ্যোক্তা হতে হলে সংগঠিত হতে হয়। যতো দূর জানি, পাঠকদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই, কোন সংস্থা নেই। পাঠক হিসেবে, বই-এর ক্রেতা হিসেবে যদি আপনি কোনো মতামত প্রকাশ করতে চান, আপনি সংবাদপত্রে, বা কোনো পত্রিকায় চিঠি দিতে পারেন। সম্পাদক আপনার চিঠি ছাপবেন, যদি সে চিঠিতে কোন প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য থাকে। কিন্তু দেশের কোনো কর্তৃপক্ষ-শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় – আপনার কোনো পরামর্শ গ্রহণ করবে, বা আপনার কোনো অভিযোগে সাড়া দেবে, সেটা আশা করবেন না।

প্রায়ই একই কথা খাটে লেখকদের ক্ষেত্রেও। লেখকদেরও বলবার মতো তেমন কোনো সংগঠন নেই। একটি প্রতিষ্ঠান আছে, লেখক শিবির। নামেই প্রকাশ, এঁরা, এই শিবিরের সেনানীরা, তাঁদের ভূমিকাকে মনে করেন সংগ্রামী ভূমিকা; এবং অনুমান করি তাঁদের এই সংগ্রাম ভাবনার, আদর্শের। লেখকদের পেশাগত সমস্যা নিয়ে তাঁদের কোনো কর্মসূচী আছে বলে শুনিনি। প্রায় এক যুগ আগে, বেশীও হতে পারে; লেখকেরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। সংস্থাটির নাম ভুলে গেছি, তবে এর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, আমাদের সংস্কৃতি জগতের সৈনাপত্য করে যিনি খ্যাতিমান হয়েছেন, মধ্যরাতের অশ্বারোহী ফয়েজ আহমদ। এই সংগঠনের কর্মসূচীতে বেশ কিছু উৎসাহসঞ্চারী ধারণা ছিল, তার মধ্যে একটাই কার্যকর হয়েছিল, তাও আধাআধি ও স্বল্পকালের জন্য। লেখক কাগজ। হোয়াইট প্রিন্ট ও নিউজ প্রিন্টের মাঝামাঝি একটা কাগজ, দামে হোয়াইট প্রিন্ট থেকে বেশ কম, এবং গুণে মধ্যম। কিন্তু হায়, বাস্তবে সে কাগজের রূপ দেখে আমরা, লেখকেরা, আর্তনাদ করেছিলাম। সে কাগজের বরাদ্দ পাওয়ার জন্য কিছু নিয়মকানুনও তৈরি হয়েছিল। এখন সে কাগজও দেখি না; আর সেই নিয়মকানুন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমি একবার একজন প্রকাশককে প্রশ্ন করেছিলাম, বইটা আপনি দু' রকম কাগজে ছাপলেন, হোয়াইট প্রিন্ট আর. নিউজ প্রিন্টে, তা লেখক কাগজ বলে যে একটা জিনিস আছে, সেদিক গেলেন না কেন? উত্তর পেলাম, ঐ কাগজ আর নিউজপ্রিন্টে কোন তফাৎ নেই। উপরন্তু নিউজপ্রিন্ট দামে আরও সস্তা।

পাকিস্তান আমলে, সরকারী উদ্যোগে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'রাইটার্স গিল্ড'। এই গিল্ডের কি অর্জন, আমার জানা নেই। সম্ভবত একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হ'ত গিল্ডের পক্ষ থেকে। কিন্তু লেখকদের জন্য আর কোনো শুভ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিনা, বলতে পারব না।

মোটের উপর, অসহায়ত্বের দিক দিয়ে লেখকেরা পাঠকদের কাছেই আছেন। নতুন লেখক, অপরিচিত লেখক এখনও এতিম, প্রকাশকের দুয়ারে তাঁর কোনো খাতির নেই। তাঁর কোন পাণ্ডুলিপি যদি প্রকাশকের হাতে পৌছায়, সে পাণ্ডুলিপি যে কোন পরামর্শকের হাতে পড়বে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বই ছাপা হলেও তিনি রয়ালটির ব্যাপারে ঠকে যাবেন। প্রকাশক তাঁকে যে হিসেব দেবেন, সেটাই চূড়ান্ত; সে হিসেবের সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো পথই খোলা নেই তাঁর জন্য।

প্রকাশকেরা বই ছাপতে আগ্রহী নন, সুতরাং সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে, এ ধরনের একটা চিন্তা একবার কেউ-না-কেউ পৌছে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দরবারে। তিনি অনুগ্রহ করে দু'দফায় কিছু নির্বাচিত লেখককে ডেকেছিলেন বঙ্গভবনে। এর একটিতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আলোচনার এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী (?) দাউদ খান মজলিস পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন : দু' কোটি টাকার মূলধন নিয়ে সরকারী উদ্যোগে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব। উপস্থিত লেখকেরা প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছিলেন। এরপর এ প্রসঙ্গে আর কিছু শোনা যায়নি।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আছে, তবে এভাবে নয়— এই ছিল লেখকদের বক্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার,- এখন শুনতে পাচ্ছি কেরালা সরকারও প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানাভাবে সহায়তা করে থাকে। তার মধ্যে একটি হ'ল বই-এর ক্রেতা হয়ে, বইগুলি প্রদেশের সহস্রাধিক গ্রন্থাগারে পৌছে দেয়া। এ ধরনের একটা কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারেরও আছে বলে শুনেছি। তবে সরকারের অর্থে কেনা বই-এর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক কম। দেশে সার্কুলেটিং লাইব্রেরীর সংখ্যাও অনেক কম, প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের তুলনায়।

কয়েকদিন আগের খবর, প্রধানমন্ত্রী গ্রন্থাগার সম্পর্কেও কথা বলেছেন : গ্রন্থাগারের বিস্তারকে একটি আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। গ্রন্থাগারিকের পেশা এদেশে একটি অবহেলিত পেশা বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। লাইব্রেরী আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাঁর পেশাকে আকর্ষণীয় করতে হবে। প্রসঙ্গত এই একটি পেশায় বিস্তর সংখ্যায় মহিলার কর্মসংস্থান হতে পারবে।

দেশের প্রকাশকেরা মনে হয় জাতীয় গ্রন্থনীতির প্রশ্নে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পুস্তক প্রকাশনাকে একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি অনেক দিনের দাবি। এ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ব্যাংক গঠিত হতে পারে বলে অনেকে বলেছেন। প্রকাশকেরা আসন্ন জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণার পূর্বে নিশ্চয়ই তাঁদের প্রস্তাবসমূহ রচনায় মনোযোগী হবেন, বা হয়েছেন। তাঁদের প্রস্তাব কি হবে, সে বিষয়ে অগ্রিম আভাস পেলে আলোচনার সুবিধে হ'তো। আশা করবো যে তাঁরা অন্তত: নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে সরকারের কাছে এমন কোন 'প্রটেকশন' ধর্মী আমদানী নীতি চাইবেন না, যা শেষ পর্যন্ত দেশের জন্য ক্ষতিকর। ইতো-মধ্যেই বিদেশী বই-এর ক্ষেত্রে যে আমদানি নীতি চালু হয়েছে, শিক্ষিত জনমত তার নিন্দা করেছে। সাহিত্যধর্মী বই-এর উপর আমদানি শুল্কের আরোপ কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকাশকেরা এটা নিজেদের স্বার্থে চাইলেও নীতিটা বৃহত্তর পাঠক সমাজের স্বার্থবিরোধী ও চিন্তার বিচারে পশ্চাদ্‌গামী।

সহজ বিবেচনায় বলে, জাতীয় গ্রন্থনীতি হবে একটি বহুমাত্রিক ধারণা। ন্যায্যমূল্যে গ্রহণযোগ্য মানের কাগজের, ও অন্যান্য মুদ্রণ-উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা এর আওতায় যেমন আসবে, তেমনি আসবে জনগণের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রয়াসের কথা। দেশের প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজে, প্রত্যেক জনপদে, বড়ো শহরের প্রত্যেক মহল্লায় লাইব্রেরী থাকতে হবে। তাহলে হিসেব করে দেখুন, লাইব্রেরীর সংখ্যা কিভাবে বেড়ে যায়। লাইব্রেরীর সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া পাঠক সংখ্যা বাড়বে না। সকল পাঠক কেন বই কিনতে যাবে? বই কিনবে লাইব্রেরী, এবং এই বই-এর একটি বড়ো অংশ আসবে সরকারের কেনা বই-এর সংগ্রহ থেকে। একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থনীতি কার্যকর করা যায়, এবং আমাদের প্রত্যাশা, সরকার সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেশগড়ার এই মহৎ কাজ হাতে নেবে।

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের নাম সংবাদপত্রে এসেছিল, অ্যাসোসিয়েশনের একটি সম্মেলনকে উপলক্ষ করে। এটি একটি মুমূর্ষু সমিতি, শুনেছিলাম, কারণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে আমার কিছুটা আগ্রহ আছে। শিক্ষকতার পেশায় বহুদিন থাকার ফলেই এটা হয়েছে। বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থাগার আমি দেখেছি। যা হোক, লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের সম্মেলনে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারিক, ইত্যাকার প্রসঙ্গে যেসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, বা যেসব প্রস্তাব রেখেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। সংবাদপত্রে এর কিছুই আসেনি। সরকার যে জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছে, সেখানে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা থাকবে, বা আছে, আমরা ধরে নিতে পারি। লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এ প্রসঙ্গে কি ভাবছে, কি প্রস্তাব পেশ করতে যাচ্ছে, সেটা পূর্বাহ্নেই প্রচার করে দিলে দোষ কি? প্রকাশকদের কাছে আমরা অতোটা আশা করব না, কারণ তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ এতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। গ্রন্থাগারিকদের সে অসুবিধা নেই।

জাতীয় গ্রন্থনীতির আওতায় আসবে দেশের ভেতরে ও বাইরে বিপণন বিষয়ক সমস্যাদি। সম্প্রতি বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থমেলার সুফল হিসেবে আমরা বিক্রয়ের উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করেছি। সেই সঙ্গে জানতে পারছি, দেশের বাইরে বাংলাদেশের বই-এর বাজার আছে, যদি সেই বাজার আমরা সৃষ্টি করতে পারি। বিদেশে যে বাঙালি সমাজ ছড়িয়ে আছে, সারাবিশ্বে, বিশেষতঃ পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহে, বিলেতে ও উত্তর আমেরিকায়, তার ক্রয়ক্ষমতা দেশের মানুষের তুলনায় বেশী। তাদের কাছে বই-এর খবর, ও বই,— দুটোই পৌছাতে হবে। এটা প্রকাশক ও বিক্রেতাদের দায়িত্ব।

উপহার সামগ্রী হিসেবে এক সময়ে বই-এর কদর ছিল; সেটা প্রায় উবে গেছে। এর জন্য আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই দায়ী করলে চলবে না, একটি ক্রয়যোগ্য ও উপহারযোগ্য সামগ্রী হিসেবে বই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এদিক দিয়ে সম্প্রতি পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, চক্ষু-নন্দন, দৃষ্টিশোভন বই আবার দেখা দিয়েছে। এখন প্রয়োজন, অন্ততঃ জন্মদিনের উপহার হিসেবে বইকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। এভাবে শুরু করা যাক, তারপর ধীরে ধীরে বিয়ের উৎসবেও বই তার জায়গা করে নিতে পারবে।

উন্নত পাঠকরুচি তৈরির জন্য দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, সে বিষয়ে সকলে অবহিত নন। একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলতেই হয়,— পরিবাগের বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি তরুণ পাঠকদের জন্য একটি পাঠক্রম তৈরি করেছে, ও সেই পাঠক্রম অনুযায়ী সদস্যদের পাঠের ও উপলব্ধির অগ্রগতির উপর দৃষ্টি রাখছে। এ ধরনের আরও উদ্যোগ আছে। পৃথকভাবে গ্রন্থাগারগুলিও এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে, এবং সরকার এদের সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে পারেন পুরস্কার প্রবর্তন করে।

সবশেষে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদপ্রার্থীরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেয়া শুরু করেছেন, নির্বাচিত হলে কে কি করবেন। এখনও পর্যন্ত কোনো প্রার্থী বলেননি, নির্বাচিত হলে তিনি প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে অন্তত একটি সার্কুলেটিং লাইব্রেরী চালু করে এই মহানগরীর একটি কলঙ্ক মোচন করবেন। যিনি এ প্রতিশ্রুতি দেবেন, আমি তাকেই আমার ভোট দেব, একজন নাগরিকের এই প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। অবশ্য ভোটার তালিকায় যদি আমার নাম থাকে।